Written by ফরিদেজ মাহবুব কামাল
Saturday, 23 April 2011 20:17 - Last Updated Monday, 25 April 2011 10:30

১৯৭০ সালের জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহ। পরন্তু বিকেলে কয়েক জন বন্ধুর সাথে ঢাকার ইসলামপুর রোডে ফুটপাথে ঘুরছি। দোকানে দোকানে তখন কেনাকাটার ভীড়। এমন সময় পাশ থেকে হঠাৎ আমার নাম ধরে ডাকার আওয়াজ। আমি এসেছি মফস্বলের গ্রাম থেকে। ঢাকায় বন্ধু-বান্ধব তেমন নেই। ফলে রাস্তার ফুটপাথে আমাকে কেউ এভাবে ডাকবেন সেটি ছিল অভাবিত। বিস্ময়ে চোখ ফেরালাম। দেখি আমাদের এলাকার অতি পরিচিত ডাক্তার। তিনি আমাদের পারিবারীক চিকিৎসকও। বেশ অমায়ীক মানুষ। তখন এমবিবিএস ও এল এম এফের পাশাপাশী ন্যাশন্যাল পাশ ডাক্তারও গ্রাম এলাকায় দেখা যেত। তিনি ছিলেন শেষোক্ত শ্রেণীর। আমার চাচার তিনি ছিলেন অতি ঘনিষ্ট বন্ধু। ডাক্তারীর পাশাপাশি তিনি রাজনীতি করতেন এবং ছিলেন আওয়ামী লীগের থানা পর্যায়ের একজন নেতা।

সম্ভবত ভাল ছাত্র হিসাবে কিছুটা পরিচিতি থাকায় এবং সে সাথে পারিবারীক চিকিৎসক হওয়ার কারণে ডাক্তার সাহেব আমাকে তিনি স্নেহের চোখে দেখেন। উনার সাথে ছিলেন আমাদের এলাকার আরেকজন ব্যক্তি যিনি পরবর্তীতে আমাদের এলাকার চেয়ারম্যান হয়েছিলেন। আমার ছোটভাইয়ের সাথে উনার মেয়ের বিয়ে হওয়াতে তিনি আমার আত্মীয়তে পরিণত হয়েছিলেন। দুঃখজনক হল, চেয়ারম্যান থাকা অবস্থায় তিনি সন্ত্রাসীদের হাতে অল্প বয়সেই নিহত হন। উনারা কুষ্টিয়ার গ্রাম থেকে ঢাকাতে এসেছেন। সামান্য কিছু কুশলাদি বিনিময়ের পর ডাক্তার সাহেব আমাকে বললেন,"আমরা বায়তুল মোকাররমে কিছু মার্কেটিং করবো,তুমিও আমাদের সাথে চল।" উনাদের সে প্রস্তাবে আমি সাথে সাথে রাজি হয়ে গেলাম। ঢাকাতে নিজ এলাকার মানুষ মানেই আপন মনে হত। ফলে তাদের সাথে সময় কাটানোর প্রচণ্ড এক আনন্দ ছিল। উনাদের খুশি করতে পারি তেমন একটা বাতিকও ছিল। আমার বন্ধু সাথীদের থেকে বিদায় নিয়ে তাদের সাথে হাটা শুরু করলাম। মার্কেটিংয়ে কোন অভিজ্ঞতা আমার আদৌ ছিল না। নতুন নতুন ঢাকায় এসেছি, ফলে ঢাকার দোকান পাঠ নিয়েও আমার অভিজ্ঞতা ছিল সামান্য। কেনাকাটায় আমার থেকে উনারা কোন সাহায্য ও পরামর্শ পাবেন না, সেটি তারা জানতেন। কিন্তু তারপরও তারা কেন সাথে নিলেন তা আমি সেদিন বুঝতে পারিনি। তবে এখন তার কারণ কিছু বুঝি। কেন বুঝি সেটির কিছু ব্যাখ্যা দেই। পাকিস্তানের একজন বিখ্যাত আইনবিদ ছিলেন জনাব আল্লাহবখশ খোদাবখশ ব্রোহী। সংক্ষেপে তাঁকে বলা হত একে ব্রোহী। তিনি পাকিস্তানের আইনমন্ত্রীও হয়েছিলেন। দেখতে কেতাদুরস্ত মিষ্টার মনে হলেও মনেপ্রাণে প্রচণ্ড ধার্মিক ছিলেন। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় তিনি শেখ মুজিবের আইনজীবী ছিলেন। তবে তাঁর আরেকটি বড় পরিচয় ছিল। সেটি হল, তিনি ছিলেন একজন উঁচুমানের দার্শনিক। সেটি প্রথম টের পাই লাহোরের এক সেমিনারে তাঁর দেয়া এক বক্তৃতা শুনে। সেটি আরো ভাল ভাবে বুঝি তাঁর লেখা বই "এ্যাডভেঞ্চার ইন সেল্ফ এক্সপ্রেশন" নামক বিখ্যাত বইটি পড়ে। বইটি অতি উচ্চাঙ্গের। বইটি আমার এতই ভাল লেগেছিল যে কিছু কিছু চ্যাপ্টার কয়েকবার পড়েছি। সে বইয়ের কিছু কথা আমার মনে এখনও রেখাপাত করে আছে। এক জায়গায় তিনি লিখেছেন, "every event is destined to promote a serious purpose"। তাঁর এ কথার মর্মার্থ যা বুঝেছি তা হল, জীবনের কোন ঘটনাই অর্থহীন নয়। লক্ষ্যহীন ভাবে সেগুলি ঘটেও না। গাছের পাতা যেমন মহান আল্লাহর অনুমতি ছাড়া পড়ে না, তেমনি কোন ঘটনাও তার অনুমতি ছাড়া ঘটে না। ব্যক্তির জীবনে ঘটে যাওয়া প্রতিটি ঘটনার একটি অন্তঃনিহিত উদ্দেশ্য থাকে। আর সেটি হল মহৎ একটি লক্ষ্যের দিকে তার জীবনকে ত্বরান্বিত করা। মানুষের দায়িত্ব হল, সেসব ঘটনা –তা ভাল হোক বা মন্দ হোক তা থেকে লাগাতর শিক্ষা নেয়া। যারা এসব ঘটনাবলি থেকে শিক্ষা নেয় তারা বিশ্ববিদ্যালয়ে না গিয়েও দার্শনিকে পরিণত হয়। কুনফুসিয়াস, সক্রেটিস, প্লেটো, গৌতম বুদ্ধের মত ব্যক্তিরা তাই কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র না হয়েও মানব ইতিহাসের বিখ্যাত দার্শনিক। কথাটা যে কতটা সত্য তা আমার জীবনে আমি বহুবার উপলব্ধি করেছি। আমার জীবনে বহু ঘটনা শুরুতে আদৌ কল্যাণকর মনে হয়নি, বরং আসন্ন ক্ষতি বা বিপদের কারণ মনে হয়েছে। কিন্তু পরে দেখেছি সেটিই আমার জীবনে বড় কল্যাণ বয়ে এনেছে। পরে এক মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়ে ম্যানেজমেন্ট সায়েন্স পড়তে গিয়ে অনেক গুরুকে বলতে শুনেছি, যারা জীবনে ঘটে যাওয়া ঘটনাবলি থেকে শিক্ষা নিতে জানে তাদের জীবনে ব্যর্থতা বলে কিছু নেই। বরং বড় বড় সে ব্যর্থতাগুলি তাদের জীবনে শিক্ষার অমূল্য সুযোগ হয়ে দাঁড়ায়। তাই সেদিন তাদের সাথে ঢাকার রাস্তায় ঘুরাটা আমার কাছে অনর্থক মনে হলেও তা বস্তুত অর্থহীন সময়ক্ষেপণ ছিল না। বরং তা দিয়েছে এমন শিক্ষা যা কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসরূপে জানবার সুযোগ হয়নি।

হয়তো তেমন একটি শিক্ষা দেয়ার জন্যই আল্লাহপাক আমাকে ইসলামপুর রোডে থেকে তুলে নিয়ে তাদের সাথে কিছুক্ষণ চলার সুযোগ করে দিয়েছিলেন। অলিগলি, মাঠেঘাটে, ঘরে-বাইরে ও নানা মানুষের মাঝে কোথায় যে শিক্ষার কত অমূল্য রত্ন ছড়িয়ে আছে তা কে জানে?

বায়তুল মোকাররমের কাছে থেকে উনারা কিছু শাড়ী কিনলেন। তারপর বললেন, "আমরা আওয়ামী লীগ অফিসে যাব। তুমিও চলো আমাদের সাথে।" আমারও কোন ব্যস্ততা ছিল না, তাই রাজী না হওয়ারও কোন কারণ ছিল না। তখন আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় অফিস পুরোন পল্টনে। বায়তুল মোকাররম ও জিপিওর উত্তর পাশে যে হাউস বিল্ডিং ফাইনান্সের বিল্ডিং তার পূর্ব পাশের রাস্তা দিয়ে কিছুটা উত্তরে গেলেই রাস্তার পশ্চিম পার্শ্বে আওয়ামী লীগের অফিস। সম্ভবত বিল্ডিংটি ছিল তিন তালা। আমরা দুই তালায় উঠলাম। রাস্তায় কাউকে জিজ্ঞেসে না করে ডাক্তার সাহেব যেভাবে সরাসরি অফিসে গিয়ে পৌছলেন তাতে মনে হল সে অফিসে তিনি পূর্বেও গেছেন, নইলে মফস্বলের লোকের পক্ষে ঢাকার কোন অফিস এত সহজে চেনা সম্ভব হয় কি করে? দুই তালায় উঠেই ডানপার্শ্বের বড় রুমটাতে সোজা ঢুকে পড়লেন। কেউ কোন বাধা দিল না। ঢুকেই দেখি শেখ মুজিব বসা। তাঁর সামনে একটি মাঝারী আকারের টেবিল। টেবিলের সামনে দুই খানি খালি চেয়ার। পাশে আরেকখানি। আমরা তিন জন একসাথে ঢুকি। ডাক্তার সাহেবকে দেখা মাত্রই শেখ মুজিব চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালেন। তিনি আমাদের তিন জনের সাথেই একে একে হাত মেলালেন। টেবিলের পাশের তিনটি চেয়ারে আমাদের বসতে বললেন। সাথে সাথে তিন কাপ চায়ের হুকুম দিলেন। ডাক্তার সাহেব বসলেন শেখ মুজিবের বাঁ পাশের চেয়ারে অতি কাছে। আমি বসলাম সরাসরি সামনের চেয়ারে। আমি তো অবাক। আমাদের ডাক্তার সাহেব এলাকায় খুব একটা বিখ্যাত লোক নন। তার নিজের কোন চেম্বার বা ফার্মেসীও নেই। তিনি রোগী দেখেন অন্যের ফার্মেসীতে বসে। গ্রামে গ্রামে ঘুরে রোগী দেখেন পুরোন এক সাইকেলে চড়ে। অথচ শেখ মুজিব তখন বিখ্যাত ব্যক্তি। তাকে দেখে শেখ মুজিব চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে স্বাগতম বলবেন সেটি দেখে আমি সেদিন অভিভূত হয়েছিলাম। বুঝতে বাকি থাকলো না, শুধু জেলা পর্যায় নয়, থানা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের নেতা-কর্মীদের সাথে শেখ মুজিবের সম্পর্ক কত গভীর। শেখ মুজিবের সেদিনের বডিল্যাংগুজে আমি এতটাই বিস্মিত হয়েছিলাম যে সে গল্প আমি পরিবর্তীতে বহু লোককে বহুবার বলেছি। তবে তার সে বডিল্যাংগুজের বিবরণ আমি আমার স্ত্রীর কাছেও বহুবার শুনেছি। আমার শ্বশুর সাহেব এক সময় ছিলেন বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলার আওয়ামী লীগের নেতা। তিনি আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফার্স্টক্লাস ফার্স্ট হয়ে শিক্ষাকতায় যোগ দেন। প্রথমে জগন্নাথ কলেজে তারপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনৈতিক বিভাগে যোগ দেন। কিন্তু শিক্ষাকতা তাঁর ভাল লাগেনি। পঞ্চাশের দশকের শুরুতেই সে পেশা ছেড়ে দিয়ে কুষ্টিয়ায় গিয়ে আইন-ব্যবসায় যোগ দেন। তাতে তিনি যথেষ্ট ভাল করেন। তিনি ছিলেন আওয়ামী লীগের প্রতিষ্টাতা সদস্য। আইয়ুব আমলের আগে কুষ্টিয়া জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান রূপেও নির্বাচিত হয়েছিলেন। তখন জেলা পরিষদের চেয়ারম্যানদের হাতে প্রচুর ক্ষমতা থাকতো। অবশ্য আইয়ুব খান এসে সে ক্ষমতা জেলাপ্রশাসকদের হাতে তুলে দেন। মাওলানা ভাষানীসহ অনেকে বড় বড় আওয়ামী লীগ নেতারা তাঁর বাসায় এসেছেন। পরে তিনি আওয়ামী লীগ ছেড়ে দেন। শেখ মুজিব যখন ৬ দফা পেশ করেন তখন পূর্ব পাকিস্তানের সতেরো জেলার মধ্যে ১৩ জেলার আওয়ামী নেতাই সেটির বিরোধীতা করে বেড়িয়ে যান যান, এবং তিনি ছিলেন তাদের একজন। আলীগড়ে পড়া অবস্থায় তিনি ছিলেন পাকিস্তান আন্দোলনের একজন একনিষ্ঠ কর্মী। সে পাকিস্তানের ক্ষতি তাঁর কাছে ছিল অসহনীয়। শেখ মুজিবের ৬ দফার মধ্যে তিনি সেটিরই পেয়ে সরে দাঁড়িয়েছেছিলেন। আওয়ামী লীগে থাকলে তিনি সম্ভবত একজন মন্ত্রী হতে পারতেন। শেখ মুজিব ছিলেন আমার শাশুড়ীর আত্মীয়, সম্পর্কে হতেন মামা। আমার শাশুড়ীও ছিলেন গোপালগঞ্জের মেয়ে। সত্তরের নির্বাচনী জলসা করতে যখন তিনি কুষ্টিয়ায় আসেন তখন তিনি এসেছিলেন আমার শ্বশুর সাহেবের বাসায়। সেটিই ছিল তার শেষ আসা। সেদিন জলসা শেষে তারা গলার ফুলের মালা আমার দাদী শাশুড়ীর গলায় পড়িয়ে দিয়েছিলেন। আমার দাদী শাশুড়ী তখন পক্ষাগ্রস্ত শয্যাশায়ী রোগী। কিন্তু সে মুহুর্তেও তিনি ভোট চাইতে ভুলেননি। আমার শ্বশুর তাঁর দলকে ভোট দিবেন না সেটি জানতেন, কিন্তু ভোট চেয়েছেন আমার শাশুড়ীর কাছে। বলেছিলেন, "জানি, জামাই তো ভোট দিবে না, তুই কিন্তু ভোটটা আমাকেই দিবি।" নির্বাচনী জয় যে শেখ মুজিবের কাছে কতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল এ হল তার নমুনা। তার রাজনীতি ছিল অতি ফোকাসড তথা সুস্পষ্ট লক্ষ্যভিত্তিক। সেটি, যে কোন ভাবে নির্বাচনী জয়। ব্যাবহারের গুণে তিনি সহজেই মানুষের সাথে এভাবে ঘনিষ্ঠ হতে পারতেন।

শেখ মুজিবকে আমি এর আগে কোনদিন দেখিনি। তবে পরে বিভিন্ন জনসভায় তাঁকে কয়েকবার আরো দেখেছি। আমি ভাবতেও পারিনি জীবনে এমন কাছে থেকে তাঁকে দেখার সুযোগ পাব। আমাদের জন্য চা আসলো। আমাদের গ্রামের বাড়ীতে চা খাওয়ার প্রচলন ছিলনা। ঢাকায় এসে তখনও চা খেতে অভ্যস্থ হয়ে উঠিনি। ফলে চা খাওয়ার চেয়ে আমার নজর ছিল রুমের অন্যদের দিকে। রুমে তখন অনেক লোক। রুমটিও মোটামুটি বড়। দেখি কোনে কোনে দাঁড়িয়ে কেউ কেউ চুপি চুপি আলাপ সারছেন। রুমের বাইরেও মানুষের ভিড়। তাদের কথাবার্তাও রুমের মধ্যে ভেসে আসছে। গুঞ্জন চারদিকে। যেন শেয়ার বাজার। শেখ মুজিব বিভিন্ন ব্যক্তির সাথে একের পর এক আলাপ সারছেন, আলাপের ফাঁকে মুখে পাইপ ঢুকিয়ে মাঝে মাঝে তামাক টানছেন। দেশের প্রেসিডেন্ট তখন জেনারেল ইয়াহিয়া খান। তিনি জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে নির্বাচন অনুষ্ঠানের ওয়াদা দিয়েছেন। এমন ভাব, সে ওয়াদায় তিনি যে অটল থাকবেন সেটি প্রমাণ করেই ছাড়বেন। এবং সেটি তিনি প্রমাণ করেছিলেনও। তবে অন্য কোন জেনেরেলের এক্ষেত্রে কোন সুনাম ছিল না। দেশজুড়ে তখন নির্বাচনের আমেজ। আওয়ামী লীগের নমিনেশন নিয়ে তখন শুরু হয়েছে জোর লবিং। সেটি সেখানে বসেই বুঝা যাচ্ছিল। আমাদের ডাক্তার সাহেব তার মুখটি শেখ মুজিবের অতি কাছে নিয়ে চুপি চুপি কিছু যেন বললেন। আমার সেটি জানার আগ্রহও ছিল না, তবে কিছু আওয়াজ যা কানে ভেসে আসলো তা থেকে বুঝলাম তিনিও কুষ্টিয়ায় দলের মনোনয়ন নিয়ে কিছু কথা শেখ সাহেবের কাছে রাখলেন।

এমন সময় দুইজন তাগড়া জোয়ান সাথে নিয়ে ঢুকলেন আব্দুর রাজ্জাক। আব্দুর রাজ্জাক তখন আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর প্রধান। ইনিই সেই আব্দুর রাজ্জাক যিনি পরে মন্ত্রী হয়েছেন। শেখ মুজিবের অতি কাছে গিয়ে তিনি দুই যুবককে পরিচয় দিলেন এই বলে, “এরা দুই জন আমাদের ভাল কর্মী। এরা লালবাগের। আপনি তো জানেন, ওখানে জামায়াতের ঘাঁটি।” শেখ মুজিব চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে যুবক দু’জনের কাঁধ চাপড়িয়ে সাবাস জানালেন। উৎসাহ দিলেন দলের জন্য বেশী বেশী কাজের। তবে আব্দুর রাজ্জাকের বক্তব্য শুনে আমি তো অবাক। কারণ, লালবাগ কখনই জামায়াতের ঘাঁটি ছিল না। লালবাগে তখন বিশাল খারেজী মাদ্রাসা। সে মাদ্রাসার শিক্ষক ছিলেন মোহাম্মদউল্লাহ হাফেজ্জী হুজুরের মত ব্যক্তিবর্গ। তারা ছিলেন ঘোরতর জামায়াত বিরোধী। ফলে আব্দুর রাজ্জাকের রাজনৈতিক জ্ঞান নিয়েই আমার কিছুটা সংশয় দেখা দিল।

যতক্ষন বসে ছিলাম দেখলাম, শেখ মুজিবের অফিস রুমের দরজাটি বরাবরই খোলা। দরজায় কোন প্রহরীর বালায় নেই। ফলে ফ্রি ট্রাফিক। ইচ্ছামত মানুষ তাঁর রুমে ঢুকছেন। যেমন নেতারা ঢুকছে, তেমনি ঢুকছে সাধারণ কর্মীরা। সেখানে দেখলাম আমার চেনাজানা এক পত্রিকার হকার। মাথায় টুপি, বিপুল বপুধারী সে হকারটির কাজ ছিল পত্রিকা বিলির পাশাপাশি চিল্লিয়ে চিল্লিয়ে আওয়ামী লীগের বানী প্রচার করা। সেখানে তাঁকে দেখেও আমি বিস্মিত হলাম। প্রশ্ন জেগেছে, এখানে এ হকারের কি কাজ? এটি তো দলের কেন্দ্রীয় অফিস। আমার প্রত্যাশা ছিল, এখানে তো তারাই আসবে যারা দেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবেন এবং নীতি নির্ধারণ করবেন। এ অফিসের কাজ হবে তাদের মাঝে সংযোগ ও সলাপরামর্শের কিছু সুযোগ করে দেয়া।

কনি্তু তমেন কোন পরবিশেই দখেলাম না। এক বশি্ঙৃখল অবস্থা। দখেলাম মাষ্টার গুলখান এক পশ্চমি পাকসি্তানী যুবাফরো করছনে। তনিতিখন পাঞ্জাব আওয়ামী লীগরে নতো। তার নাম পূর্বে পত্রকািয় পড়ছে,ি এবার সামনে দখেলাম।

উনশি শ' সত্তররে জানুয়ারী মাসটছিলি নরি্বাচনী জনসভার মাস। আওয়ামী লীগ তখন দশে জুড়ে জোরশেোরে নরি্বাচনী প্রচারণার উদ্যোগ নয়িছে।ে জলোয় জলোয় তখন প্রধান প্রধান সড়গুলতিে বড় বড় নৌকা আর শখে মুজবিরে নামে গটে তরৌীর হড়িকি। কুমলি্লা থকেে আগত আওয়ামী লীগরে এক নতো শখে মুজবিকে প্রশ্ন করলনে, তা'ঁর আগমন উপলক্ষ্যে কুমলি্লাতে ক'টগিটে বানানো হবে? প্রশ্নটআিমার কাছে অদ্ভুত লাগলো। নতোর নামে ক'টগিটে বানানো হবে সটেরি জন্য আবার শখে মুজবিকে জজি্ঞসে করতে হবে? এটকিসিরে নমুনা? এটতিো মরেুদন্ডহীন পদসবেী চরতি্র? সে প্রশ্নরে জবাবে শখে মুজবি সদেনি কবিলছেলিনে সটেসি্পষ্ট শুনতে পারনি।ি গণতন্ত্র সাধারণ মানুষরে মাঝে ক্ষমতায়ন ঘটায়, কনি্তু এটকিকি্ষমতায়নরে নমুনা? ক'টগিটে বানাতে হবে সে মামূলী সদি্ধান্তটওি একজন জলো পর্যায়রে নতো নতিে পারছনে না। এসছেনে সরাসর িশখে মুজবি থকেে জানত!ে এটকিকিম তাজ্জবরে বষিয়? দখেলিাম সবাই শখে মুজবিকে স্যার বলে ডাকছনে। একজন বল্লনে, "স্যার, আমআিগামী রববার আপনার বাসায় দখো করতে চাই।" উত্তরে শখে মুজবি পাইপে মুখ লাগয়িে গম্ভীর ভাবে বল্লনে সটেসিম্ভব। আরো বল্লনে, "জানো তো, সাড়ে সাত কোটবিাঙালীর জন্য আমাকে কছিু ভাবতে হয়? অতএব রববারে সম্ভব নয়।" তার সে উক্ততিে আমসিদেনি অবাক হয়ছেলিাম। দশেবাসীর জন্য একজন নতোর ভাবনা তো সর্বক্ষণরে। এটকিকিোন দনৈক্ষণ বঁধেে হয়? তাছাড়া দনৈক্ষণ বঁধেে হলওে সটেকিি ঘোষণা দয়োর মত?

তবে সে সন্ধাতে বসি্ময়রে আরো কছিু বাঁকী ছলি। একজন ব্যক্ত িমুজবিরে বাঁ পাশে দাড়য়িে কছিু বলা শুরু করলনে। বুঝা যাচ্ছলি তনিএিসছেনে মফস্বল থকে।ে তনিযিা ববিরণ শুনাচ্ছলিনে তা হল, জামায়াতে ইসলামরে লোকরো নাকগি্রামে গ্রামে গয়িে প্রচার করছে যে তাদরে ঢাকায় যতেে হব।ে তারা আরো বলছে শখে মুজবি নাকতিাদরে ঢাকায় হাজরি হতে বলছেনে। আমার কাছে তার এ ববিরণ মথি্যা ও হাস্যকর মনে হল। ১৮ই জানুয়ারতিে পল্টন ময়দানে জামায়াতে ইসলামীর প্রথম নরি্বাচনী জনসভা। সে সভায় মাওলানা মওদূদীসহ দলটরি কনে্দ্রীয় নতোদরে বক্ততা দয়োর কথা। পশ্চমি পাকসি্তান থকেে মাওলানা মওদূদীর সাথে আরো অনকেে কনে্দ্রীয় নতো আসছনে। জামায়াতরে নতো ও কর্মী বাহনিী তখন সে জনসভাকে যতটা সম্ভব বশিাল ও ঐতহিাসকি করার জন্য দশেব্যাপী আপ্রাণ চষে্টা করছলি। তাদরে পরকিল্পনা ছলি, সকল জলো থকেে যত বশেী সম্ভব লোক জড় করা। কনি্তু তারা সজেন্য শখে মুজবিরে নাম ব্যবহার করবে সটেছিলি সম্পূর্ণ মথি্যা। এটরি কোন প্রমাণ নাই। এটকিচিাটুকার এক কর্মীর পক্ষ থকেে নতোর সামনে তার নতোর ইমজেকে বড় করে দখোনোর চষে্টা? কনি্তু শখে মুজবি সে মথি্যাকে কীরূপে গ্রহণ করলনে সটেতিার মুখ থকেে প্রকাশ পলে না। তনিজিবাবে কছিুই বল্লনে না। কনি্তু নজিে থকেে যা বল্লনে, সটেছিলি আমার কাছে মনে হল যমেন ভয়ানক তমেনবিসি্ময়কর। মুখরে পাইপ থকেে টানা তামাকরে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে রাগতঃ স্বরে বল্লনে, "লাহোর-করাচীর ব্যবসায়ীদরে পয়সা নয়িে মওদূদী বাঙ্গালী কনিতে আসছ।ে দখেে নবি কেকিরে মটিংি কর।ে" তার কথা শুনে আমতিবাক। তনিবিলছনে, মওদূদী বাঙ্গালী কনিতে আসছনে। তা হলে প্রশ্ন হল, বাঙ্গালী কবিকি্রয়যোগ্য পণ্য? মুজবিরে চোখে এটইি কবিাঙালীর মূল্যায়ন? মাওলানা মওদূদী পাকসি্তানরে একটরিাজনতৈকি দলরে নতো। দশেরে যে কোন স্থানে জনসভা করার অধকিার তা'ঁর নাগরকি অধকিার। সে অধকিারকে খর্ব করার কোন অধকিার শখে মুজবিরে ছলি না। সটেহিলে তা হবে এক শাস্তযিোগ্য ফৌজদারঅিপরাধ। বাঙ্গালী কনোই যদমিাওলানা মওদূদীর পরকিল্পনা হয় তবে সটেরি মোকাবলো তাঁকে রাজনতৈকি ভাবে করা উচতি। কনি্তু সে

Written by ফিরোজ মাহবুব কামাল
Saturday, 23 April 2011 20:17 - Last Updated Monday, 25 April 2011 10:30

অভিযোগ এনে পল্টন ময়দানে মাওলানা মওদূদীকে মিটিং করতে দেয়া হবে না -এটি কি ধরণের বিচার? এটি তো ফ্যাসীবাদ। এভাবে জনসভা বানচাল করা কি কোন সভ্য দেশে শোভা পায়? অথচ মনে হল, মুজিব দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ যে তিনি জামায়াতে ইসলামীকে মিটিংই করতে দিবেন না। আওয়ামী লীগ নেতারা নিজেদেরকে গণতান্ত্রিক রূপে জাহির করেন। কিন্তু এটি কি গণতন্ত্রের নমুনা?

মুজিবের সে কথাটি রুমের অনেকেই শুনলেন। কিন্তু দেখলাম কারো মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়া নেই। যেন তিনি কোন রূপ অন্যায় বা অশোভন কথা বলেননি। এটিই মনে হল আওয়ামী লীগের সংস্কৃতি। সংস্কৃতি থেকেই তো মানুষ সিদ্ধ-অসিদ্ধ, ন্যায়-অন্যায়ের একটি মাপকাঠি পায়। এজন্য কাউকে বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়া লাগে না। সে সংস্কৃতির সাথে খাপ খাইয়ে কথা বললে সেটি তো মামূলীই মনে হবে। সন্ত্রাস বা ফ্যাসীবাদ যখন দলীয় সংস্কৃতি হয়ে দাঁড়ায় তখন সে দলের নেতা রুমভর্তি মানুষের সামনে অন্যদলের মিটিং ভাঙ্গার ন্যায় দম্ভোক্তিটি প্রকাশ্যে করতে পারেন। ডাকাত পাড়ারও নিজস্ব একটি সংস্কৃতি থাকে। সেখানে কে কতটা নৃশংস ভাবে ডাকাতি করলো, ধর্ষন করলো বা খুন করলো সেটিই বাহবা পায়। ভদ্রতা, মানবতা, দয়াবোধ সে পাড়ায় বাজার পায় না। এমন এক অসুস্থ্য সংস্কৃতির কারণেই এক ডাকাত ঘর ভর্তি অন্য ডাকাতদের সামনে নৃশংস ডাকাতির বিবরণ বুক ফুলিয়ে দেয়। সেটি সেখানে বীরত্বের রূপে মনে গণ্য হয়। কিন্তু সভ্য সমাজে সেটি ঘটে না। তেমনি পতিতা পল্লির সংস্কৃতিতে অশ্লিল বা উলঙ্গ থাকাটি কোন অসাধারণ কিছু নয়। মার্কিন প্রেসিডেন্ট নিক্সন প্রতিদ্বন্দী ডিমোক্রাটদলীয় প্রার্থীর কোন জনসভা পণ্ড করেননি। শুধু তাদের হেডঅফিসে গোপন খবর সংগ্রহের জন্য লুকানো যন্ত্র ফিট করেছিলেন। আর এ অপরাধেই তাঁকে প্রেসিডেন্ট পদ ছাড়তে হয়েছিল। পিটার ম্যান্ডেলসন ছিলেন ব্রিটিশ লেবার দলের এক প্রভাবশালী নেতা ও মন্ত্রী। তাকে বলা হত কিং মেকার। তাঁর সমর্থনের বলেই টনি ব্লেয়ার প্রধানমন্ত্রী হন। তিনি এক ব্যবসায়ীর ভাড়া করা প্যারিসের এক হোটেলে রুমে ছিলেন বলে তাঁকে মন্ত্রীত্ব হারাতে হয়েছিল। যদি কোন মন্ত্রী মিথ্যা কথা বলছেন এটি যদি প্রমাণিত হয় তবে সে অপরাধে ব্রিটেনে এখনও মন্ত্রীত্ব যায়। সততা, সত্যবাদীতা, আইনের প্রতি শ্রদ্ধা –এগুলো সভ্য সমাজের জন্য অপরিহার্য। অপরদিকে অন্যদলের রাজনৈতিক মিটিং পন্ড করা ও সে মিটিংয়ে মানুষ খুন করা তো মারাত্মক অপরাধ। অথচ জামায়াতের ১৮ই জানুয়ারীর মিটিংয়ে সেটিই ঘটেছিল। এবং সেটিই আমি স্বচোখে দেখেছি। সে বিবরণও পরে দিব।

আওয়ামী লীগ অফিস থেকে বিষন্ন মন নিয়ে ফিরিলাম। দুশ্চিন্তা বাড়লো দেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে। পাকিস্তানের রাজনৈতিক আকাশে তখন ঘন কালো মেঘ। যখন তখন ঝড় শুরু হতে পারে। তবে তখনও ভাবিনি,পাকিস্তান হয়তো আর বাঁচবে না। কারণ সে বিতর্ক তখনও শুরু হয়নি। বরং শেখ মুজিব নিজেও মাঠে ময়দানে জোরে জোরে পাকিস্তান জিন্দাবাদ ধ্বনি দিচ্ছেন। ইয়াহিয়া এবং পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর এ্যাডমিরাল আহসানের সাথেও দেখা করছেন। তখন তিনি ব্যস্ত নির্বাচনী বিজয় নিয়ে। তবে মুজিবের মত ব্যক্তির হাতে যে গণতন্ত্র বাঁচবে না সে বিষয়ে আমার সেদিন বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। প্রচণ্ড সে হতাশা নিয়েই সেদিন আমি আওয়ামী লীগ অফিস থেকে ফিরেছিলাম। আমি তখন এক তরুন কলেজ ছাত্র। কিন্তু আমার সেদিনের সে ধারণা বিন্দুমাত্র মিথ্যা প্রমাণিত হয়নি। ১৯৭৪ সালে একদলীয় বাকশালী গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে সেটি তা প্রমাণ করে ছেড়েছেন।

ঢাকায় বসবাস কালে আমার রুটিন হয়ে দাঁড়িয়েছিল পল্টন ময়দানের প্রতিটি জনসভায় যোগদান করা। ঢাকায় এটিই ছিল জনসভার জন্য সবচেয়ে প্রসিদ্ধ জায়গা। আমার বড় আকর্ষণ ছিল মাওলানা ভাষানীর বক্তৃতা। ঢাকায় অনুষ্ঠিত কয়েকটি জনসভায় আমি তাঁর বক্তৃতা শুনেছি। তার জনসভায় প্রচুর লোকসমাগম হত। তার বক্তৃতার ভঙ্গিটা ছিল অতি চিত্তাকর্ষক। মানুষকে খ্যাপানোর দিক দিয়ে তাঁর জুড়ি ছিল না। । একবার পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আগত ওয়ালীখানপন্থি ন্যাপের নেতাদের বক্তৃতাও শুনলাম। অবশেষে এল ১৯৭০য়ের ১৮ই জানুয়ারি। সেদিনও আমি গিয়ে হাজির। দেখি চারিদিক থেকে প্রচুর লোক আসছে। মনে হচ্ছিল অনেক লোক হবে। বহু লোক এসেছে মফস্বল থেকে। তখনও মাওলানা মওদূদীসহ কোন কেন্দ্রীয় নেতাই মঞ্চে এসে হাজির হননি। তখন পল্টন ময়দানের দক্ষিণ ও পশ্চিম পার্শ্বে ছিল ইটের দেয়াল। মঞ্চ হত ময়দানের পূর্ব দিকে। দেখলাম জামায়াতের স্বেচ্ছাসেবীরা মাঠের বিভিন্ন স্থানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিরাপত্তা সুদৃঢ় করার ব্যবস্থা করছে। তাদের হাতে বিভিন্ন শ্লোগান বিশিষ্ঠ পোষ্টার। ময়দানের উত্তরের দিকে দেখলাম কিছু পুলিশ। ইতিমধ্যে বক্তৃতা শুরু হয়ে গেছে। জেলা ও প্রাদেশিক পর্যায়ের কিছু নেতা তখন বক্তৃতা দিয়ে মাঠ গরম করছেন। লক্ষ করলাম,পশ্চিম দিকের জিন্নাহ এভিনিউতে এখন যা বঙ্গবন্ধু এভিনিউ নামে পরিচিতি, সেখানে বেশ কিছু সংখ্যক যুবক দাড়িয়ে জটলা পাকাচ্ছে। মিটিং তখন আধাঘন্টাও চলেনি। এরপর শুরু হল মিটিং লক্ষ করে বড় বড় পাথর নিক্ষেপ। মাঠে তখন হাজার হাজার মানুষের ভিড়। এমন ভিড়ের মাঝে পাথর ছুড়লে লক্ষভ্রষ্ট হওয়ার উপায় নেই। পাথর গুলো সহজেই তার কাঙ্খিত টার্গেটে গিয়ে আঘাত হানছিল। লাগছিল কারো মাথায়, কারো গায়ে, কারো বা পায়ে। অনেকের মাথা ফেটে রক্ত বেরুচ্ছিল। অনেকে মাটিতে পড়ে যাচ্ছিল। কিছুক্ষণ এরূপ অবিরাম পাথর বর্ষণের পর শুরু হল উত্তরের পাশ থেকে দলবদ্ধ হামলা। কয়েক শত যুবক লাঠি নিয়ে জনসভার মধ্যে ঢুকে পড়ার চেষ্টা করছিল। তাদের রুখার জন্য সাহসিকতার সাথে প্রাণপণ চেষ্টা করছিল জামায়াতের স্বেচ্ছাসেবকগণ। প্রায় আধাঘন্টা ধরে তারা তাদের রুখে রেখেছিল। এর মধ্যে এল পুলিশ। পুলিশ দেখে জামায়াতের স্বেচ্ছাসেবীরা মনে হয় ভেবেছিল,এবার পুলিশ হামলাকারীদের রুখবে। আর এতেই শুরু হল আরেক বর্বরতা। এবং সেটি ভয়ানক ভাবে। অথচ এতক্ষণ স্বেচ্ছাসেবীরা ভালই রুখছিল। তারা বার বার ধাওয়া করে তাদেরকে জলসা থেকে বহুদূর হটিয়ে রেখে আসছিল। কিন্তু পুলিশ হামলাকারদের না রুখে বরং তাদের জনসভার মধ্যে ঢুকার সুযোগ করে দিল। ফলে সম্পূর্ণ ভেঙ্গে পড়লো জনসভার নিরাপত্তা। সহজেই পণ্ড হল জনসভা। এবার নেতাকর্মীদের প্রাণ নিয়ে বাঁচাবার পালা। দেখলাম লম্বা শেরওয়ানী,পাঞ্জাবী,আলখেল্লা পরিহিত ৬০-৭০ বছরের বৃদ্ধকে দক্ষিণের দেয়াল টপকিয়ে প্রাণ বাঁচাবার কি করুণ চিত্র!পালাবার সময়ও তাদের উপর পড়ছে পাথর,কারো পিঠে উপর লাঠির আঘাত। সেখানে সেদিন তিনজন প্রান হারান। আহত হন শত শত। আহতদের অনেকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে গিয়ে পুণরায় আহত হন ছাত্র লীগ কর্মীদের হাতে। পল্টন ময়দানের নিকটতম প্রতিবেশী হল গভর্নর হাউস। কিন্তু এতবড় হামলার সে খবর কি সেদিন সেখানে পৌছেছিল? এত বড় হামলার পরও কাউকে সেদিন একদিনের জন্যও গ্রেফতার করা হয়নি। কারো কোন শাস্তিও হয়নি। প্রশাসন আওয়ামী লীগকে যে কতটা ছাড় দিয়েছিল এ হল তার প্রমাণ।

পরদিন দৈনিক পত্রিকাগুলোর খবর দেখে আরেক বিস্ময়। দৈনিক ইত্তেফাক ও দৈনিক সংবাদ বিশাল ব্যানার হেডিং দিয়ে খবর ছেপেছিল,জনসভায় আগত জনতার উপর জামায়াতকর্মীদের বর্বর হামলা। একটি জাতি যখন অধঃপতনের দিকে যায় তখন সে দেশের দুর্বৃত্তরাই শুধু বিবেকশূন্য হয় না, ভয়ানক অমানুষে পরিণত হয় মানুষরূপীরাও। সেদিনের দৈনিক ইত্তেফাক ও দৈনিক সংবাদ পড়ে অন্তত সেটিই মনে হয়েছিল। কয়েকটি পত্রিকায় নিহতদের ছবি ছাপা হয়েছিল। নিহতদের তিন জনই এসেছিল মফস্বলের জেলা থেকে। তাদের ছবি দেখে সেদিন এটিই প্রশ্ন জেগেছিল,কি অপরাধে তাদের হত্যা করা হল? কি জবাব দেয়া হবে তাদের আপনজনদের? আপনজনগন সান্তনাই বা পাবে কীরূপে? কোন সভ্যদেশে কি এটি ভাবা যায়? কোন সভ্যদেশে এমন ঘটনা ঘটলে সকল দল মিলে তার একটি তদন্ত দাবী করে। কিন্তু আওয়ামী লীগ সে দাবীও করেনি। আওয়ামী লীগ অফিসে বসে সেদিন মুজিবের মুখ থেকে মাওলানা মওদূদীর মিটিং পণ্ড করার যে দৃঢ় অঙ্গিকার শুনেছিলাম, সেটি সেদিন স্বচোখে দেখলাম। তবে এতটা নৃশংসতার মধ্য দিয়ে যে এটি ঘটবে, সেটি সেদিন ভাবতে পারিনি। সেদিন যারা মারা গিয়েছিল বা আহত হয়েছিল তারা ছিল এই বাংলারই নিরীহ-নির্দোষ অতি সহজ-সরলমানুষ। যে কোন সভ্যদেশে এমন প্রতিটি হত্যাকাণ্ডই প্রচণ্ড

বর্বরতা। সে বর্বর ঘটনার আমি একজন প্রত্যক্ষ সাক্ষী। দেখেছি তার মূল নায়ককেও। হত্যাকাণ্ড সবার চোখের সামনে ঘটে না। কিন্তু যার সামনে ঘটে তার ঘাড়ে আল্লাহপাক চাপিয়ে দেন এক গুরুতর দায়ভার। সে হল সে সংঘটিত অপরাধের প্রত্যক্ষ সাক্ষী। ইসলামে সে সাক্ষী গোপন করা কবীরা গোনাহ। বাংলাদেশে সে কবীরা গুনাহটি অতি বেশী বেশী হয় বলেই শত শত খুন হলেও তার বিচার হয় না। এর ফলে ভয়ানক খুনিরা মহান নেতাতে পরিণত হয়। শেখ মুজিবকে জাতির পিতা বা বঙ্গবন্ধু যাই বলা হোক না কেন, আমি সেদিন তাঁর মধ্যে যে রূপটি দেখেছিলাম সেটি আদৌ কোন মানবতার রূপ নয়। বাঙ্গালীর বন্ধুর রূপতো নয়ই। বরং ভয়ানক এক মানব-শত্রুর। সেটি আরো প্রবল ভাবে প্রকাশ পেয়েছিল তাঁর শাসনামলে। বন্দী অবস্থায় সিরাজ শিকদার হত্যার পর তিনি সংসদে দাড়িয়ে বলেছিলেন, “কোথায় আজ সিরাজ সিকদার?” তিনি শুধু ত্রিশি হাজারেরও বেশী বিরোধী রাজনৈতিক কর্মীকেই হত্যা করেননি, হত্যা করেছিলেন গণতন্ত্র ও ন্যূনতম মৌলিক মানবিক অধিকারকেও। প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন একদলীয় বাকশাল, বন্ধ করেছিলেন সকল বিরোধী দল ও তাদের পত্র-পত্রিকা। আমার স্মৃতির ভাণ্ডারে দিন দিন আরো বহু স্মৃতিই জমা হয়েছে। সেগুলির কোনটি আনন্দ দেয়, কোনটি প্রচণ্ড পীড়াও দেয়। কিন্তু সেগুলির মাঝে যে স্মৃতিটি এখনওআমাকে দারুন পীড়া দেয় তা হল মুজিবের হাতে হত্যাকাণ্ডের এ করুণ স্মৃতি।

২৩/০৪/২০১১